১ম অধ্যায়ঃ ফরজ পরিচিতি

প্রারম্ভিক কথাঃ ফরজ ইসলামী বিধানের পালনীয় বিষয়সমূহের মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয়। শারীয়া'হ নির্ধারিত বিধান মতে কোনো ফরজ বিষয়কে নীতিগতভাবে অস্বীকার, প্রত্যাখ্যান, অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করলে কুফর হয় আর নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে বাস্তব জীবনে পালন না করলে মহাপাপ (কবীরাহ গোনাহ) হয়। তাই ফরজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা আমাদের ফরজ দায়িত্ব। আর এদায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে সহযোগিতা করতেই আমাদের এ অধ্যায় "ফরজ পরিচিতি"। বিষয়টিকে সহজভাবে বুঝার জন্য এ অধ্যায়কে আমরা কয়েকটি অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। যথা..

অনুচ্ছেদঃ ১. ফরজ পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ২. ফরজের গুরুত্ব ও পালনীয় বিধান
অনুচ্ছেদঃ ৩. অকাট্ট দলীল পরিচিতি
অনুচ্ছেদঃ ৪. ফরজের প্রকারভেদ
অনুচ্ছেদঃ ৫. ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়াহ পালনের পদ্ধতি
অনুচ্ছেদঃ ৬. ফরজের ব্যাপারে আমাদের ঈমান ও আক্বীদাহ
অনুচ্ছেদঃ ৭. শারীয়া'হ আইনের ফিক্বহী বিন্যাস
অনুচ্ছেদঃ ৮. ফরজ
অনুচ্ছেদঃ ৯. ওয়াজিব
অনুচ্ছেদঃ ১০. সুন্নাহ ও মুস্তাহাব
অনুচ্ছেদঃ ১১. হালাল
অনুচ্ছেদঃ ১২. মুবাহ
অনুচ্ছেদঃ ১৩. মাকরূহ
অনুচ্ছেদঃ ১৪. হারাম
অনুচ্ছেদঃ ১৫. ফরজ কীভাবে হয় এবং ফরজের বৈশিষ্ট্যসমূহ
অনুচ্ছেদঃ ১৬. ফরজ শব্দের ব্যবহারিক গুরুত্ব
অনুচ্ছেদঃ ১৭. স্বার কথা বা আসল কথা
অনুচ্ছেদঃ ১৮. ক্ষেত্রবিশেষে বিধানের সঠিক মান নির্ণয় ও আমাদের করনীয়

অনুচ্ছেদঃ ১. ফরজ পরিচিতি

শব্দ পরিচিতিঃ আরবী "ফারদ্ব" শব্দকে আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় "ফরজ"। ফারদ্ব অর্থ নির্ধারিত, মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য মহান আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত করণীয় দায়িত্বসমূহকে আরবীতে "ফারদ্ব" বলা হয় আর ফার্সিতে বলা হয় "ফরজ"।

ফিক্বহী ফারদ্ব পরিচিতিঃ ফারদ্ব (ফরজ) একটি ফিক্বহী পরিভাষা, শারয়ী' পরিভাষায় তথা কুরআন ও হাদীছে বলা হয়েছে "মাকতুব"। ফিক্বহী মতে "যে কাজটি অকাট্ট দলীল (আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিশঠিত এসব করণীয় কাজকে বলা হয় ফারদ্ব (ফরজ) আর এসব বর্জনীয় কাজকে বলা হয় হারাম।

অনুচ্ছেদঃ ২. ফরজের গুরুত্ব ও পালনীয় বিধান

ফারদ্ব (ফরজ) হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে করণীয় বিষয় আর হারাম হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে বর্জনীয় বিষয়। কোনো ফরজকে বর্জন, অবজ্ঞা বা ঐচ্ছিক মনে করা কুফর আর ছেড়ে দেওয়া মহাপাপ তথা কাবীরাহ গুনাহ।

অনুচ্ছেদঃ ৩. অকাট্ট দলীল পরিচিতি

ফিক্বহী পরিভাষায় অকাট্ট দলীল বলতে বুঝানো হয় আল-কুরআনের মুহকাম (বিধান সম্বলিত সুস্পষ্ট) আয়াত ও মুতাওয়াতির মানের হাদীছ। ফিক্বহী মতে ফরজ প্রমাণ করার জন্য এমন মানের দলীলের প্রয়োজন হয়। এ দুই প্রকার দলীলের বাইরে যত দলীল আছে এগুলো দিয়ে ফরজ প্রমাণ করা যায় না। তাইতো অনেক বিষয় সাহীহ হাদীছে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইমামগণ এগুলোকে সুন্নাহ, মুস্তাহাব অথবা মুবাহ বলেছেন।

সারকথাঃ

- ফরজ হচ্ছে আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক নির্ধারিত করণীয়। (সুতরাং আল্লাহ বা রাসূল ছাড়া অন্য কেউ কোনো কিছু ফরজ করতে পারবে না।)
- অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত বিধানকে ফরজ বলা হয়। (সুতরাং এমন মানের দলীল ছাড়া কোনো কিছুকে ফরজ বলা যাবে না)
- অকাট্ট দলীল হচ্ছে আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছ। (সুতরাং সাধারণ সাহীহ হাদীছ বা কারো অভিমতের উপর ভিত্তি করে কোনো কিছু ফরজ হয় না।)

অনুচ্ছেদঃ ৪. ফরজের প্রকার ভেদ

ফিক্বহী মতে ফরজ দুই প্রকায় হয়ে থাকে। যথাঃ ব্যক্তির উপর ফরজ আর সমাজের উপর ফরজ। যে কাজ প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ হয় এবং সবাইকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে এটা পালন করতে হয় এটাকে বলা হয় "আল-ফারদ্ব আল-আ'ইন" আমাদের সমাজে যা "ফরজে আইন" নামে খ্যাত। আর যে কাজ মুসলিম সমাজের উপর ফরজ হয় এবং সমাজের কিছু মানুষ পালন করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায় এটাকে বলা হয় "আল-ফারদ্ব আল-কিফায়াহ" আমাদের সমাজে যা "ফরজে কেফায়া" নামে পরিচিত।

ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়ার উপমাঃ

ফরজে আইনের উপমা হলঃ সালাত, সিয়াম, হিজাব, ইত্যাদি।
আর ফরজে কিফায়ার উপমা যেমনঃ বিচার, শাসন, নিয়মিত জিহাদ ও যুদ্ধ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, কুরআন হাদীছ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য তথা যথাযথ জ্ঞান অর্জন, ইত্যাদি।

অনুচ্ছেদঃ ৫ . ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়াহ পালনের পদ্ধতি

ফরজে আইন সবাইকে পালন করতে হয় আর ফরজে কিফায়া সমাজ ও জাতির পক্ষ থেকে কিছু মানুষ পালন করলেই আদায় হয়ে যায়। আর কেউ যদি না করে তবে সবাই এজন্য দায়ী হয় এবং সকলেরই পাপ হয়।

অনুচ্ছেদঃ ৬. ফরজের ব্যাপারে আমাদের ঈমান ও আক্বীদাহ

মুসলিম হিসেবে আমাদের উপর যেসব কাজকে ফরজ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে প্রথমত আমাদেরকে নীতিগতভাবে এগুলো মেনে নিতে হবে, অতঃপর অত্যাবশ্যকীয়ভাবে মেনে চলতে হবে। কোনো ফরজকে নীতিগতভাবে অস্বীকার, অমান্য, অবজ্ঞা বা অবহেলা করা অথবা ঐচ্ছিক মনে করা কুফর। আর ফরজ বিষয়গুলোকে নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া স্বত্ত্বেও কাজে বাস্তবায়িত না করা মহাপাপ তথা কাবীরাহ গোনাহ।
ফরজে আ'ইন হিসেবে আমাদেরকে যেসব কাজ করতেই হবে এসব কাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাও ফরজ। আর এ ফরজ দায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে সহায়তা করতেই "ফরজে আইন" নামক এ বইটি সংকলন করা হল।
ফরজে আইনের সুস্পষ্ট কোনো তালিকা কুরআন বা হাদীছে উল্লেখ করা হয়নি, লেখক ব্যক্তিগতভাবে এক এক করে অনুসন্ধান করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাই এতে ভুল-ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কারো চুখে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর আবেদন রইল।
উল্লেখিত বিষয়টিকে আরো পরিষ্কারভাবে বুঝতে হলে ফিক্বহী বিন্যাসসমূহ একটু স্ববিস্তারে জানতে হবে। তাই নিম্নে বিষয়টি উল্লেখ করা হল..

অনুচ্ছেদঃ ৭. শারীয়া'হ আইনের ফিক্বহী বিন্যাস

শারীয়া'হ আইনের বিধানসমূহ সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে তথা ইতিবাচক ও নেতিবাচক। অতঃপর গুরুত্ব বিবেচনায় এ দুই ধরণের বিধান আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে তথা ঐচ্ছিক ও আবশ্যিক।

শারীয়া'হর যেসব বিধান মেনে চললে ছওয়াব হয় আর না মানলে পাপ হয় না; এগুলো হলো ঐচ্ছিক বিধান, শারয়ী' পরিভাষায় এসবকে বলা হয় তাত্বাওয়্যু'। গুরুত্ব, ফজিলত ও দলীল বিবেচনায় তাত্বাওয়্যু' ধরণের ইবাদাতকে ফিক্বহী শাস্ত্রে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমনঃ সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল, ইত্যাদি।
আর ইসলামী শারীয়া'হর যেসব বিধান মেনে নেওয়া এবং মেনে চলা আবশ্যক, যা না মানলে পাপ হয় এগুলো হলো আবশ্যিক বিধান। আবশ্যিক বিধানকে ফিক্বহী পরিভাষায় বলা হয় ফরজ। ফরজ বিষয়সমূহ মেনে না নিলে কুফর হয় আর নীতিগতভাবে মেনে নেওয়ার পর বাস্তব জীবনে মেনে না চললে পাপ হয়, মহাপাপ।

কোনো ফরজকে অস্বীকার করলে, প্রত্যাখ্যান করলে বা অবজ্ঞা করলে অথবা ঐচ্ছিক মনে করলে কুফর হয়। কোনো মুসলিম এমন কুফর করলে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় আর সে হয়ে যায় চির জাহান্নামী মুনাফিক। মুনাফিক মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হওয়া এবং তার জন্য দোয়া করাও নিষিদ্ধ। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ৮৪)

ইসলামী শারীয়া'হর ইতিবাচক বিধান যেমন আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক হয়ে থাকে, তেমনিভাবে নেতিবাচক বিধানও দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ হারাম ও মাকরূহ।

মোটকথা ফিক্বহের পরিভাষায় শারীয়া'হ বিধানকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, মুস্তাহাব, নফল, মুবাহ, মাকরুহ তানযিহী, মাকরুহ তাহরিমী ও হারাম।

অনুচ্ছেদঃ ৮. ফরজ

মূল আরবী শব্দ "ফারদ্ব" অর্থ নির্ধারিত। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় ফরজ। ইসলামের ফরজ বিধানসমূহ মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তাই এগুলো মেনে নেওয়া ও মেনে চলা আবশ্যক। প্রতিটি মুসলিমকে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে ফরজ বিধানসমূহ মেনে নিতে হয় এবং মেনে চলতে হয়। কোনো ফরজকে নীতিগতভাবে অস্বীকার করা, অমান্য করা বা অবজ্ঞা করা অথবা কোনো ফরজ বিষয় নিয়ে ভিন্নমত বা দ্বিমত পোষণ করা অথবা কোনো ফরজ বিষয়কে ঐচ্ছিক মনে করা কুফর। আর ফরজ বিষয়কে নীতিগত ভাবে মেনে নেয়ার পর বাস্তব জীবনে মেনে না চলা কাবীরাহ গুনাহ।

মুসলিমদের করণীয় হিসেবে যেসব বিধান অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় এবং এটা ফরজ হতে শারীয়া'হ ভিত্তিক কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে কেবল এগুলোই ফরজ হয়।

উল্লেখ্য অকাট্ট দলীল বলতে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত না হলে কোনো কিছু ফরজ হয় না।

অনুচ্ছেদঃ ৯. ওয়াজিব

ওয়াজিব শব্দের অর্থ আবশ্যকীয়। মালিকী, শাফিয়ী'সহ অন্যান্য ফিক্বহ মতে ফরজ আর ওয়াজিব শব্দ দুটি হলেও আসলে বিষয় একই। আর এজন্যই ফিক্বহী কিতাবাদীতে ওয়াজিব বলে সাধারণত ফরজকেই বুঝানো হয়। তবে হানাফী ফিক্বহ মতে ফরজ ও সুন্নতের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান হচ্ছে ওয়াজিব। যদিও হানাফী কিতাবসমূহেও সাধারণত ওয়াজিব বলে ফরজকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

যে কাজ অকাট্ট দ্বলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় তবে সাহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং রাসূল সা. কাজটি ধারাবাহিক ভাবে করেছেন, কখনো বাদ দেননি, হানাফী ফিক্বহ মতে এমন কাজকে ওয়াজিব বলা হয়। যেমনঃ বিতর সালাত, ঈদ সালাত, কুরবানী, সাদাক্বাতু-ল-ফিতর, ইত্যাদি।

ওয়াজিব যেহেতু অকাট্ট ভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয় নয় তাই ওয়াজিবকে অস্বীকার বা অমান্য করলে অথবা এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলে কুফর হয় না। যেমনঃ ইমাম আবু-হানীফাহ রাহি. থেকে বর্ণিত এক মতে "বিতর" সালাত ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিয়ী', ইমাম আহমাদ এবং ইমান আবু-হানীফাহর প্রসিদ্ধ দুই শিষ্য ইমাম আবু-ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহিঃসহ সকলের মতে "বিতর" সালাত ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত। অর্থাৎ ইমান আবু-হানীফাহ ছাড়া বাকি সবাই বিতর ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করেছেন, এতে কিছুই হয়নি। হানাফী অনেক আলিমের মতে ওয়াজিব পালন না করলে পাপ হয়।

অনুচ্ছেদঃ ১০. সুন্নাহ

সুন্নাহ অর্থ রীতিনীতি, আদর্শ বা তরিকা। আমাদের সমাজে উর্দু উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় সুন্নত। আল-কুরআনে আল্লাহর রীতিনীতিকে বলা হয়েছে "সুন্নাতুল্লাহ" হাদীছে রাসূল সাঃর আদর্শকে বলা হয়েছে "সুন্নাতু রাসূল"।

শারীয়া'হ পরিভাষায় রাসূল সাঃর আদর্শকে সুন্নাহ বলা হয়। তবে ফিক্বহী পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয় "যে কাজ ফরজ নয় তবে রাসূল সা. করেছেন বলে সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে"। ফিক্বহী পরিভাষায় যে সব কাজকে সুন্নাহ বলা হয় এগুলোকে আবার দুই ভাবে বিভক্ত করা হয়ঃ

- যে সব কাজ রসূল সা. সাধারণত করতেন এগুলোকে বলা হয় সুন্নাহ ক্বাইমাহ বা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ।
- যেসব কাজ রাসূল সা. মাঝে মাঝে করেছেন এসবকে বলা হয় সুন্নাহ মুস্তাহাব্বাহ বা মুস্তাহাব।

অনুচ্ছেদঃ ১১. হালাল

হালাল অর্থ বৈধ। ইসলামী শারীয়া'হ মতে যেসব কাজ বৈধ বলে প্রমাণিত হয়েছে ফিক্বহী পরিভাষায় এগুলোকে হালাল বলা হয়। ফিক্বহী সুত্র মতে..

- সাধারণত দুনিয়াবী কাজ, খাদ্য, পানীয় হালাল বলে বিবেচিত হয়, যদি বিষয়টি হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট এবং মান-সম্পন্ন দলিল বিদ্যমান না থকে। উসুলে ফিক্বহ (ফিক্বহের মূলনীতি) এর সুত্র মতে একে বলা হয় "আস্বলু-শ-শাই আল-

ইবাহা'হ" অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের মূল হলো বৈধতা তাই দুনিয়াবী কোনো কর্ম, কোনো খাদ্য বা পানীয়কে অবৈধ বলতে হলে দলীল উপস্থাপন করতে হবে।

- আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে সবকিছুকেই অবৈধ হিসেবে গন্য করা হয়, যদি না এর পক্ষে মান-সম্মত কোনো দলীল বিদ্যমান থাকে। উসুলে ফিক্বহ (ফিক্বহের মূলনীতি) এর সুত্র মতে একে বলা হয় "আস্বলু-শ-শাই আল-হু'রমাহ" অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়ের মূল হলো অবৈধতা তাই কোনো ইবাদাতকে বৈধতা দিতে চাইলে দলীল উপস্থাপন করতে হবে।

অনুচ্ছেদঃ ১২. মুবাহ

যেসব কাজকে বৈধ বলে প্রমাণ করা যাচ্ছে না আবার অবৈধ বলেও প্রমাণ করা যাচ্ছে না এগুলোকে মুবাহ বলা হয়।

অনুচ্ছেদঃ ১৩. মাকরূহ

মাকরূহ অর্থ অপছন্দনীয়। মানব জীবনে কিছু কাজ এমন আছে যা করা বৈধ কিন্তু উত্তম নয়। "যে সব কাজ করা বৈধ কিন্তু উত্তম নয় /অন্য কথায় যেসব কাজ করার জন্য দলীল পাওয়া যায় আবার নিষিদ্ধ বলেও দলীল পাওয়া যায়; ফিক্বহী পরিভাষায় এগুলোকে মাকরূহ বলা হয়"। বিশেষ করে যেসব কাজ করতে রাসূল সা. নিষেধ করেছেন বা অপছন্দ করেছেন, আবার নিজেই করেছেন বা এমন কাজ করতে সাহাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন সাধারণত এমন কাজকে মাকরূহ বলা হয়"। যেমন..

- দাঁড়িয়ে পেশাব করাঃ রাসূল সাধারণত এমনটি করতেন না। তবে একবার করেছেন বলে বুখারীতে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন বুখারী পবিত্রতা অধ্যায়ঃ হাদীছ নঃ ২২৪) তাই কোনো কোনো ইমাম একাজকে মাকরূহ বলেছেন তবে অনেকেই জাইজ বলেছেন।
- দাঁড়িয়ে পানাহারঃ রাসূল সা. সাধারণত এমন করতে নিষেধ করতেন। আবার কখনো কখনো তিনি নিজেই করেছেন এবং সাহাবাদেরকে করতে দেখে অনুমোদন দিয়েছেন বলে হাদীছে উল্লেখ আছে। তাই কোনো কোনো ফক্বীহ একে মাকরূহ মনে করেন।

মাকরূহ এর প্রকার ভেদঃ মাকরূহ আবার দুই প্রকার হয়ে থাকে। সাধারণ মাকরূহ আর তুলনামূলক কঠিন মাকরূহ। সাধারণ মাকরূহকে বলা হয় "মাকরূহ তানযিহি" আর তুলনামূলক কঠিন মাকরূহকে বলা "মাকরূহ তাহরিমি"।

অনুচ্ছেদঃ ১৪. হারাম

হারাম শব্দের শাব্দিক অর্থ নিষিদ্ধ, যেমনঃ হারাম কর্ম বা হারাম খাদ্য। বিশেষভাবে সম্মানিত শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমনঃ হারাম মাস, মাসজিদ হারাম, ইত্যাদি। আবার বিশেষভাবে সংরক্ষিত অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমনঃ রাজার হারাম (আমাদের সমাজে যাকে হেরেম বলা হয়) মানে রাজ প্রাসাদের সংরক্ষিত এরিয়া, ইত্যাদি।

পারিভাষিকভাবে হারাম হচ্ছে ফরজের বিপরীত বিধান। অর্থাৎ "যেসব বিষয় নিষিদ্ধ বলে আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং বিষয়টি হারাম হওয়ার শারীয়া'হ অনুমদিত কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই এগুলোকে হারাম বলা হয়"।

সতর্কতাঃ কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা ফিক্বহী সূত্র মতে নিষিদ্ধ হয়েছে তবে এর দলীল হারাম হবার জন্য যথাযথ নয়। এসব ব্যাপারে হারাম শব্দ ব্যবহার করা বৈধ নয়, তাই এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

অনুকরণীয় যুগের আলিমগণ সাধারণত এমন ব্যাপারে মাকরূহ, উত্তম নয়, নিষিদ্ধ এবং সর্বোপরি বৈধ নয়, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু বর্তমান সমাজে এসব ব্যাপারেও ব্যাপকভাবে হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই বিষয়টিকে পরিষ্কার করে বুঝানো উচিত।

আসলে নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দুই প্রকার হয়ে থাকেঃ মানসূস হারাম ও মুজতাহাদ মামনু'। অন্য কথায় "হারাম বিন-নাস্ব" তথা কুরয়ান সুন্নাহর দলীল দ্বারা প্রমানিত হারাম আর "মামনু' বি-ল-ইজতিহাদ" তথা ইমামগণের ইজতিহাদ দ্বারা নিষিদ্ধ।

মানসূস হারামঃ যে হারাম কুরআন বা হাদীছে সরাসরি বর্ণিত এবং অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত একে মানসূস হারাম বলা হয়। যে হারাম অকাট্য দলীল (কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত বা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এটাকে নীতিগতভাবে না মানলে বা অস্বীকার করলে কুফর হয়। যেমনঃ কুফর করা, শিরক করা, মদ পান করা, প্রবাহমান রক্তকে পানীয় বা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা, শূকরের মাংস বা এ দিয়ে তৈরি খাবার বা পানীয় গ্রহণ করা, ইত্যাদি। এ সকল কাজ-ই মামসূস হারাম।

তবে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোকে সাধারন মানুষ হারাম মনে করে কিন্তু আসলে এগুলো হারাম নয়। কারণ এসব বিষয় হারাম হবার জন্য যথাযথ দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান নেই। তবে (আহা'দ বা আযীয পর্যায়ের) সাহীহ হাদীছে নিষিদ্ধ হবার কারণে আজকাল অনেকেই এগুলোকে হারাম বলে থাকেন কিন্তু আসলে এগুলো হারাম নয়। তাই এমন বিষয়কে হারাম হিসেবে না মানলে কুফর হবে না।

ইজতিহাদের মাধ্যমে নিষিদ্ধঃ ইজতিহাদের মাধ্যমে নিষিদ্ধ বলে আমরা এখানে এমন সব বিষয়কে বুঝিয়েছি যেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে যথাযথ ক্বাত্বয়ী' দলীল নেই তবে ইমামগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে এসব বিষয়কে নিষিদ্ধ বলেছেন তথা না করার পরামর্শ দিয়েছেন অথবা ওয়াহিদ বা আযীয মানের হাদীছ দ্বারা এসব বিষয়কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আসলে এসব বিষয় হারাম নয় বরং মাকরুহ তবে আমাদের সমাজে অতি বাড়াবাড়ির ফলে কিছু মানুষ এসব বিষয়কে হারাম বলে থাকেন। যেসব বিষয় নাস্ব (কুরআন হাদীছ) দ্বারা প্রমাণিত হারাম নয় তবে ফিক্বহী সূত্রের আওতায় এসে নিষিদ্ধ হয়েছে এসব কাজকে..

- প্রথম যুগের কিতাবাদিতে মাকরুহ বলা হত,
- তারপর বলা হত মাকরুহ তাহরিমী,
- তারপর হারামের নিকটতম,
- তারপর নাজাইজ বা অবৈধ
- আর এখন অনেকেই বলে ফেলেন হারাম,
- কেও কেও আরো এক ধাপ এগিয়ে বলে থাকেন সাফ হারাম।

আসব বিষয় আমাদের বর্তমান সমাজে হারাম হিসেবে বিবেচিত হলেও আসলে শারীয়া'হ মতে এগুলো হারাম নয়। তাইতো এসব বিষয়কে নীতিগতভাবে হারাম না মানলে অথবা এসব ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলে কুফর হয় না। এমনকি এসব ব্যাপারে ভিন্নমত গ্রহণ করে এমন কাজে জড়িয়ে পড়লেও পাপ হয় না। যেমনঃ কচ্ছপ খাওয়া, কাঁকড়া খাওয়া, ইত্যাদি।

হানাফী ফিক্বহ মতে এসব খাদ্য মাকরুহ কিন্তু বর্তমান সময়ের কিছুলোক একটু বাড়াবাড়ি করে বলে থাকেন হারাম। হানাফী ফিক্বহ মতে এসব খাবার নিষিদ্ধ হলেও অন্যান্য ফিক্বহ মতে অনুমোদিত। এসব খাদ্যকে হালাল মনে করার কারণে অন্য ফিক্বহ পালনকারী কেও কাফির হবে না এবং যেসব মুসলিম এসব খাচ্ছেন তারাও পাপী নন।

বিঃ দ্রঃ = আসলে এসব বিধানের বেলায় হারাম শব্দ ব্যবহার না করে অন্য শব্দ (যেমনঃ অনুমোদনহীন) ব্যবহার করাই ভাল। পূর্ব যুগের আলিমগণ সাধারণত এসব ব্যাপারে হারাম শব্দ ব্যবহার করেননি। তারা যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন এর অর্থ দাড়ায়ঃ (অমুক ইমাম এটা অপছন্দ করেছেন, অমুক এটাকে পছন্দ করেননি, অমুকের মতে এটা অনুমোদিত নয়, অমুক বলেছেন এতে অসুবিধা আছে, ইত্যাদি) কিন্তু বর্তমানে অনেকেই বাড়াবাড়ি করে বলে থাকেন হারাম বা সাফ হারাম।

অনুচ্ছেদঃ ১৫. ফরজ কী ভাবে হয় এবং ফরজের বৈশিষ্ট সমূহ

- ইসলামের যেসব করণীয় বিধান অকাট্ট দলীল (**قطعي دليل**) দ্বারা সন্দেহমুক্তভাবে প্রমাণিত এবং বিষয়টি ফরজ হওয়ার ব্যাপারে শারীয়া'হ অনুমোদির কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই, ফিক্বহী পরিভাষায় কেবল এ বিষয়গুলোকে-ই ফরজ বলা হয়।
- ফিক্বহী পরিভাষায় আল-ক্বুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং মুতাওয়াতির মানের হাদীছই কেবল অকাট্ট দলীল (**قطعي دليل**) হিসেবে গণ্য হয়।
- ইসলামী বিধান মতে কোনো বিষয় ফরজ করার একমাত্র বৈধ অধিকারী হলেন মহান রাব্ব আল্লাহ তায়া'লা এবং আল্লাহ কর্তৃক অনুমোদিত হবার কারণে নবী সা.
- আল্লাহ বা রাসূলের যেসব আদেশ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় ওইসব আদেশ মেনে নেওয়া ও মেনে চলা আমাদের উপর ফরজ হয়।
- ফরজ যেহেতু আল্লাহ বা রাসূলের আদেশ হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। তাই এসবের বিরোধিতা করা, একে অবজ্ঞা বা অমান্য করা কারো জন্যই বৈধ নয় এবং এর বিপরীতে ভিন্নমত বা দ্বিমত পোষণও বৈধ নয়।
- কোনো ফরজ বিধান মানতে অস্বীকার করা, অমান্য করা, অবজ্ঞা করা অথবা কোনো ফরজ বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া বা কোনো ফরজকে ঐচ্ছিক মনে করা কুফর।
- ফরজ বিধান যেহেতু আল্লাহ বা রাসূলের আদেশ হিসেবে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এবং যেহেতু এমন বিধানের বিরোধিতা করা বা এর বিপরীতে অবস্থান নেয়া বা দ্বিমত করা কুফর। তাই এমন কোনো বিধান নিয়ে ফিক্বহী

ইমামগণের কেউ দ্বিমত করেননি, তাই এসব ব্যাপারে কোনো ভিন্নমত পাওয়া যায় না। বরং ফরজ বিধানের বাইরে কোনো দলীল পাওয়া গেলে এটাকে নফল বা সুন্নত হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। নীচে এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন ধরুন..

উদাহরণঃ ১. আল-কুরআনের সুস্পষ্ট একটি আয়াতে (বাক্বারাহঃ ১৮৩) বলা হয়েছে "তোমাদের উপর ফরজ করা হয়েছে সিয়াম" (রোজা পালন)
আয়াতটি যেহেতু সুস্পষ্ট এবং সিয়াম ফরজ হবার বিধানটি যেহেতু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত তাই এতে ভিন্নমতের কোনো অবকাশ নেই এবং কেও ভিন্নমত পোষণ করলে এটা মেনে নেওয়া হবে না। বরং যে ব্যক্তি এর সাথে দ্বিমত করবে বা ভিন্নমত পোষণ করবে তাকে বিভ্রান্ত হিসেবে দেখা হবে। কারণ অকাট্ট দলীলের বিপরীতে দ্বিমত করার বা ভিন্নমত পোষণ করার এখতিয়ার কারো নেই এবং এমন ভিন্নমত গ্রহণ যোগ্য নয়।

আবার বাক্বারার ১৮৫তম আয়াতে রামাদ্বান (রমজান) মাস সম্পর্কে বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি মাসটি পেল সে যেন অবশ্যই রোজা রাখে"। আল-কুরআনের এ আয়াতটিও সুস্পষ্ট, তাই রমজান মাসে রোজা পালন করা ফরজ হবার বিধানটি অকাট্ট দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। ফলে এ ব্যাপারেও দ্বিমত বা ভিন্নমতের অবকাশ নেই এবং ফিক্বহী ইমামগণের কেও ভিন্নমত পোষণ করেননি। এ ব্যাপারে কেও দ্বিমত করলে এটা মানা হবে না বরং দ্বিমতকারী বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।
পক্ষান্তরে অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছেঃ রমজান ছাড়া অন্য মাসেও রাসূল সা. রোজা রেখেছেন এবং রোজা রাখতে উৎসাহিত করেছেন। এসব বিষয়ে বর্ণিত অনেক হাদিছই সাহীহ সনদে প্রমাণিত হলেও রমজান ছাড়া অন্য কোনো রোজা ফরজ নয়। বরং সাহীহভাবে প্রমাণিত হবার কারণে এসব রোজাকে নফল বা সুন্নত হিসেবে দেখা হয়। এমনকি এসব রোজার কোনটির গুরুত্ব কত এবং কোনটি পালনে কত নেকী হবে, এসব বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলে বা দ্বিমত করলেও মেনে নেওয়া হয় যদি এ দ্বিমত দলিল ভিত্তিক হয়।

উদাহরণঃ ২. আল-কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে "সালাত কায়েম কর"। সুতরাং সালাত কায়েমের বিষয়টি অকাট্ট দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত ফরজ।
অনেক হাদীছে বলা হয়েছে দৈনিক পাঁচ বার সালাত কায়েম করতে হবে। এ সম্পর্কিত হাদীছসমূহ এতো ব্যাপক ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে এসব বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ে চলে গেছে। তাই দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায়ের বিষয়টিও অকাট্ট দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রামাণিত ফরজ।
সুতরাং সালাত কায়েম করা ফরজ এবং দৈনিক পাঁচবার করা ফরজ। বিষয়টি যেহেতু অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাই এ ব্যাপারে দ্বিমত বা ভিন্নমতের কোনো সুযোগ নেই এবং ফিক্বহী ইমামগণের কেও ভিন্নমত পোষণ করেননি। আর কেও করলেও মেনে নেওয়া হবে না বরং যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে দ্বিমত করবে বা ভিন্নমত পোষণ করবে তাকে বিভ্রান্ত বলে গণ্য করা হবে।
তবে পাঁচ সালাতের বাইরেও রাসূল সা. আরো অনেক সালাত আদায় করেছেন, অনেক সালাতের ফজিলত বয়ান করেছেন এবং মানুষকে এসব সালাতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। এসব ব্যাপারে অনেক হাদিছও সাহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তথাপিও এসব সালাত ফরজ না হয়ে নফল বা সুন্নত হয়েছে এবং এসব সালাতের গুরুত্ব ও ফজিলত নিয়ে ভিন্নমত বা দ্বিমত পোষণের কারণে কাউকে বিভ্রান্ত বা কাফির বলা হয় না।

উদাহরণঃ ৩. আল-কুরআনের আরেকটি আয়াতে (বাক্বারাহঃ ২২৮) বলা হয়েছে "তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ ইদ্দত পালন করবে তিন ক্বুরু"। এখানে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হয়েছে...

- "তাদেরকে ইদ্দত পালন করতে হবে"। কথাটি সুস্পষ্ট এবং অকাট্ট দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত। তাই তালাকের পর ইদ্দত পালন করা ফরজ। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই, কোনো সন্দেহ নেই।
- ইদ্দত পালনে সংখ্যা হলো তিন। এটাও সুস্পষ্টভাবে অকাট্ট দলীল দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত তাই এটাও ফরজ। এ ব্যাপারেও কোনো দ্বিমত নেই, কোনো সন্দেহ নেই।
- ইদ্দত হবে তিন "ক্বুরু" এ ক্বুরু শব্দের দলীল অকাট্ট তবে বিষয়টি সুস্পষ্ট নয়। কারণ ক্বুরু শব্দের অর্থে ভিন্নতা রয়েছে। ক্বুরু শব্দের এক অর্থ মহিলাদের ঋতুস্রাব, আবার দুই স্রাবের মধ্যবর্তী সময়কেও ক্বুরু বলা হয়। তাই ইদ্দত গণনা স্রাব দিয়ে হবে, না দুই স্রাবের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সময় দিয়ে? এ বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়নি। ফলে এ দুই অর্থের যে কোনো ১টিকে নির্ধারণ করে এককভাবে ফরজ বলা যাবে না, বরং ফরজ হবে দুই অর্থের যে কোনো একটি। ফলে এখানে দ্বিমতের বা ভিন্ন মতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আর এ জন্যই দ্বিমত হয়েছে এবং ভিন্নমত বিদ্যমান রয়েছে। কেও (আবু-হানীফাহ) বলেছেন "ইদ্দত হবে তিন স্রাব আর কেও (শাফিয়ী') বলেছেন দুই স্রাবের মধ্যবর্তী তিন পবিত্রতা"।

অনুচ্ছেদঃ ১৬. ফরজ শব্দের ব্যবহারিক গুরুত্ব

আসলে ফিক্বহের পরিভাষায় ফরজ শব্দটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী এবং এর ব্যবহারের পরিধি খুবই সীমিত। মানসম্পন্ন দলীল এবং দলীলের গুণগত মান অকাট্ট না হলে ফরজ শব্দটি ব্যবহার করা বৈধ হবে না। তাইতো দেখা যায়ঃ আগেকার আলিমগণ শব্দটি ব্যবহারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তখনকার হাদীছ, হাদীছ বিশ্লেষণ এবং ফিক্বহের কিতাবাদিতে দেখা যায়, সাধারণ মানের হাদীছ বা অকাট্ট নয় এমন দলীল উপস্থাপন করার পর অথবা অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন কোনো বিষয়ে আলোচনা করার পর উনারা যে সব পরিভাষা ব্যবহার করতেন এসবের অর্থ হচ্ছে...

- আমরা এটা পছন্দ করেছি।
- আমরা এটা পছন্দ করিনি।
- এমন করা যেতে পারে।
- এমন করতে অসুবিধা নেই।
- এমন করা উত্তম।
- এমন করা উচিত নয়।
- সর্বোপরি তারা বলেছেনঃ এমন করা বৈধ বা বৈধ নয়।

কিন্তু আজকাল পরিভাষা ব্যবহারে আমরা একেবারে রেড লাইনে চলে এসেছি। আজকাল তেমন বিচার বিবেচনা না করেই আইনের সর্বোচ্চ পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে, বিধানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। আর এসব কর্মকাণ্ডের জন্য সবচেয়ে বেশী দায়ী পরিপক্ক জ্ঞানের অভাব ও দলকানা মনোভাব তথা দলীয় মতাদর্শকে দ্বীন হিসেবে লালন ও পালন করার মনমানসিকতা। আশা করিঃ উপরে উল্লেখিত তিনটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি বুঝে নেওয়া অনেকটা সহজ হবে।

জ্ঞাতব্যঃ বর্তমান সময়ে আমাদের মাঝে যেসব বিষয়ে সবচেয়ে বেশী অভাব রয়েছে এর অন্যতম হচ্ছে পরিপক্ক জ্ঞান, তাকওয়া, সূক্ষ বিচার বিশ্লেষণ, ইত্যাদি। আর এসবের পিছনে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল দলকানা মনমানসিকতা। নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য শুরুতেই একেবারে হার্ড লাইনে চলে যাওয়া আজকাল অনেকের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। তাইতো দেখা যায়ঃ নিজেদের মনমানসিকতাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে কোনোকিছু ফরজ প্রমাণ করার জন্য অনেক সময় দ্বাইফ হাদীছ, মুনকার হাদীছ, এমনকি মাওদ্বু' হাদীছও ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে কোনো আলিমের অভিমত, নিজের উত্থাপিত যুক্তি, ইত্যাদি দিয়েও ফরজ প্রমাণ করার অপচেষ্টা করা হয়।
অথচ আমাদের মনে রাখতে হবেঃ সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সব সময় সবকিছু ফরজ হয় না। অনেক সময় এমন হয় যে, রাসূল সা. নিজে একটি কাজ করেছেন বা কাজটি করার জন্য অন্যকে অনুমতি দিয়েছেন, তথাপিও কাজটি ফরজ নয়।

অনুচ্ছেদঃ ১৭. স্বার কথা বা আসল কথা হল

রাসূল সা. কোনো কাজ করলেই এটা ফরজ হয়ে যায় না, বরং রাসূল সাঃর কৃত কাজ কখনো ফরজ হয়, কখনো সুন্নত, কখনো মুস্তাহাব, আর কখনো এমন কিছুই হয় না। তিনি কখনো কোনো কাজ করে থাকেন শুধু বৈধতা প্রকাশ করার জন্য। যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে..

- রাসূল সা. হাজ্ব করেছেন এবং হাজ্ব করতে বলেছেন। আর আসলেই হাজ্ব করা ফরজ।
- রাসূল সা. কুরবাণী করেছেন, কুরবাণী করতে বলেছেন, কুরবাণী করতে উৎসাহ দিয়েছেন। তবুও কুরবাণী করা ফরজ নয় বরং হানাফী মতে ওয়াজিব আর অধিকাংশ ইমামের মতে সুন্নত।
- রাসূল সা. ফজরের সুন্নাত পড়েছেন, নিয়মিত পড়েছেন এবং পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে অনেক সাহীহ হাদীছ বর্ণিত আছে। তথাপিও ফজরের সুন্নত ফরজ হয়নি বরং সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. অযু করার সময়ে কুল্লি করতে এবং নাকে পানি দিতে কঠিনভাবে আদেশ দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে অনেক সাহীহ হাদীছ বিদ্যমান রয়েছে কিন্তু তথাপিও এসব কাজ ফরজ হয়নি, বরং হানাফী মতে সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. জুমুয়া'র দিনে গোসল করতে আদেশ করেছেন। তথাপিও এটা ফরজ হয়নি বরং মুস্তাহাব শ্রেণীর সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. তাহাজ্জুদ পড়েছেন, তাহাজ্জুদ পড়তে উৎসাহিত করেছেন। তথাপিও তাহাজ্জুদ ফরজ হয়নি বরং সুন্নত হয়েছে।
- রাসূল সা. উমরাহ করেছেন, উমরাহর জন্য দীর্ঘ সফর করেছেন, (হুদাইবিয়ার বছর) জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উমরাহ করতে এসেছেন। উমরাহ করতে উৎসাহিত করেছেন। তথাপিও উমরাহ ফরজ হয়নি, বরং অনেক ইমামের মতে সুন্নত বা নফল হয়েছে।
- রাসূল সা. বাহনে চড়ে তাওয়াফ ও সায়ী' করেছেন, বাহনে বসে সালাত আদায় করেছেন। তথাপিও এটা ফরজ হয়নি বরং বৈধ হয়েছে।
- রাসূল সা. বাম পা দিয়ে টয়লেটে প্রবেশ করেছেন, ডান পা দিয়ে বের হয়েছেন, একবার স্ত্রী সহবাস করার পর আরেকবার করার আগে তথা দুই সহবাসের মধ্যখানে অযু করেছেন। তথাপিও এসব কাজ ফরজ হয়নি বরং আদব বা শিষ্টাচার হয়েছে।
- রাসূল সা. কাবাব (পোড়া বা ভাজা মাংস) খেয়েছেন, নাবীয (শুকনা ফল ভিজানো পানি) পান করেছেন, কদু খেয়েছেন, সাদা কাপড় পছন্দ করেছেন। তথাপিও এসব ফরজ হয়নি বরং ব্যক্তিগত পছন্দ বা মুস্তাহাব হয়েছে।
- রাসূল সা. খাদ্যের সাথে কাঁচা পিঁয়াজ খাননি। তথাপিও এটা হারাম হয়নি বরং ব্যক্তিগত অপছন্দ হয়েছে।

- রাসূল সা. কাঁচা পিঁয়াজ ও কাঁচা রসূন খেয়ে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন, তথাপিও এটা হারাম হয়নি বরং মাকরূহ তানযিহী হয়েছে।
- এমনকি কোনো কাজ রাসূল সা. নিজে করেছেন বলে সাহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমানিত হওয়া সত্ত্বেও অনেক ইমাম এটাকে মাকরূহ পর্যন্ত বলেছেন। যেমন..

হুযাইফাহ রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছে রাসূল সা. এলাকার আবর্জনা ফেলার স্থানে এসে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। (বুখারীঃ ২২৪, পবিত্রতা অধ্যায়, পরিচ্ছেদঃ ১৫৮)
তথাপিও দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম নয় বরং অনেকের মতে মাকরূহ আর কারো কারো মতে মাকরূহও নয়। কারণ এটা রাসূল সাঃর সাধারণ অভ্যাস ছিল না বরং তিনি বৈধতা প্রকাশের জন্য কাজটি করেছেন।

ইবন উ'মার রা. বলেনঃ একদা আমি (আমার বোন রাসূল সাঃর স্ত্রী) হাফস্বার ঘরের (ছাদের) উপর আরোহণ করলাম। আমি দেখতে পেলাম নবী সা. শামের দিকে মুখ এবং ক্বিবলার দিকে পিঠ করে (পেশাব বা পায়খানার) হাজত পুরা করছেন। (তিরমিযীঃ ১১, পরিচ্ছন্নতা অধ্যায়, হাদীছটি সাহীহ)
এতদসত্ত্বেও হানাফীদের মতে পেশাব বা পায়খানার সময়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা মাকরূহ। শাফিয়ীদের মতেও উন্মুক্ত ময়দানে পেশাব বা পায়খানার সময়ে ক্বিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা মাকরূহ।

আসলে কোনো কাজ ফরজ হবার জন্য "রাসূল সা. করেছেন বা করতে বলেছেন" শুধু এতোটুকু-ই যথেষ্ট নয়। বরং কোনো বিধান ফরজ হবার জন্য যদি মানসম্পন্ন দলীল অর্থাৎ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমানিত অকাট্ট দলীল (তথা আল-কুরআনের মুহকাম আয়াত অথবা মুতাওয়াতির মানের হাদীছ) বিদ্যমান থাকে এবং এর বিপরীতে মানসম্পন্ন কোনো দলীল না থাকে কেবল তখনই এটা ফরজ হিসেবে গন্য হয়।
সুতরাং আমাদেরকে এ বিষয়গুলো সদা মনে রাখতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। নতুবা বিধানের সঠিক মান নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং এ ব্যাপারে তালগোল পাকিয়ে ধুম্রজাল তৈরি করা হবে আর এর ফলে বিভ্রান্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদঃ ১৮. ক্ষেত্র বিশেষে বিধানের সঠিক মান নির্ণয় এবং আমাদের করনীয়

উপরে আলোচিত বিষয়সমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এসবের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা এবং প্রতিটি বিষয়কে যথাযথ মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে সদাসর্বদা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নতুবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কম গুরুত্ব দিয়ে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শারীয়া'হ নির্ধারিত বিষয়াদিকে উল্টে ফেলা হবে আর আজকাল অনেক ক্ষেত্রেই এমনটি করা হচ্ছে। আজকাল এসব বিষয় নিয়ে নেগেটিভ ও প্রজেটিভ দু-ভাবেই অনেক বাড়াবাড়ি করা হয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কেমন হওয়া উচিত এবং যে বা যারা এসব নিয়ম-নীতি মেনে চলে না তাদের ব্যাপারে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত এ সম্পর্কে কিছু বাস্তব নীতিমালা নিম্নে পেশ করা হলো। যাতেকরে আমাদের জীবনে এর বাস্তবায়নকে আরো সহজ করা যায় এবং আল্লাহর প্রতিটি বিধানকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে অতি বাড়াবাড়ি ও বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা সহজ হয়। যেমন..

১. ঈমান ও আক্বীদাহঃ দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমান ও আক্বীদাহ। আমাদেরকে সদাসর্বদা নিজেদের ঈমান ও আক্বীদাহ সঠিক, সুন্দর ও স্বচ্ছ রাখতে হবে। আমাদের ঈমান ও আক্বীদাহকে সঠিক ও স্বচ্ছ রাখতে হলে এ ব্যাপারে অকাট্ট দলীল খুঁজতে হবে এবং শুধুমাত্র অকাট্ট দলীলের ভিত্তিতেই ঈমানকে সাজাতে হবে। এমন হতে পারলে কেবল তবেই আমাদের ঈমান সঠিক, সুন্দর ও স্বচ্ছ হবে। আর ঈমান আক্বীদাহর বিষয়গুলো যেহেতু শুধু অকাট্ট দলীল দ্বারাই প্রামণিত হবে তাই এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত বা ভিন্নমত থাকবে না ফলে আমাদেরকে ঈমান ও আক্বীদাহ বিষয়ে অটল ও অবিচল থাকা সহজ হবে।

হুঁশিয়ারিঃ তবে সাবধান! যে বা যারা এসব বিষয়ে দ্বিমত করবে অথবা এগুলোকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করবে অথবা যথাযথ দলীল ছাড়াই এতে সংযোজন করে আমাদের ঈমান ও আক্বীদায় বিকৃতি ঘটাতে চেষ্টা করবে তাদের সাথে নৈতিক ও আদর্শিক সম্পর্ক রাখা যাবে না বরং এদের সাথে ওয়ালায়াত (নৈতিক ও আদর্শিক) সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে এবং তাদেরকে ওয়ালী (মিত্র বা অভিভাবক) হিসেবে মেনে নেওয়া যাবে না, যদিও রক্তের সম্পর্কে তারা আমাদের আপনজন হয়। কোনো মুসলিম এমন হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করলে সে জালিম এবং পাপিষ্ঠ হিসেবে গণ্য হবে। (দেখুন সূরাহ তাওবাহঃ ২৩)

তবে তারা আমাদের আত্মিয় হলে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখতে হবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, যদিও নীতিগত ও আদর্শগতভাবে তাদের কথা মেনে নেওয়া যাবে না (দেখুন সূরাহ লুক্বমানঃ ১৫) এবং তাদের আনুগত্য করা যাবে না। (দেখুন সূরাহ আহযাবঃ ৪৮)

২. কুফর ও শিরকঃ কুফর ও শিরক আমাদের ঈমান, আক্বীদাহ ও আমল সকল বিষয়ের সাথেই সম্পৃক্ত এবং ঈমান বিনষ্টকারী ও আমাল ধ্বংসকারী মহাপাপ। কোনো মুসলিম কোনো প্রকার কুফর বা শিকরে জড়িয়ে পড়লে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে সকল আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যায় এবং ওই ব্যক্তি মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যায়। তাই আমাদেরকে যাবতীয় কুফর ও শিরক থেকে বিরত থাকতে হবে, এসব ব্যাপারে অটল ও অবিচল থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারেও উপরে উল্লেখিত হুঁশিয়ারি মেনে চলতে হবে।

৩. ফরজ ও হারামঃ আমাদের করণীয় ফরজ এবং বর্জনীয় হারামসমূহও যেহেতু অকাট্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত তাই এসব ব্যাপারেও অটল ও অবিচল থাকতে হবে এবং উল্লেখিত হুঁশিয়ারি মেনে চলতে হবে। তবে যে বা যারা আল্লাহ ও রাসূল প্রদত্ব ফরজ ও হারামকে নীতিগতভাবে মেনে নেবে বাস্তব জীবনে তারা যদি এসব মেনে নাও চলে তবুও (তারা যেহেতু কুফর থেকে বিরত থেকেছে তাই তারা মুনাফিক নয় বরং ফাসিক তাই) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তবে তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে যাতে আমাকে/আপনাকেও পাপের সঙ্গী বানাতে না পারে।

৪. তাত্বাওয়্যু' ও মাকরুহঃ তাত্বাওয়্যু' ধরণের করণীয়সমূহকে পছন্দ করা এবং এগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করা আর মাকরুহ ধরণের বর্জনীয়সমূহকে অপছন্দ করা এবং এগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা একজন মুঅমিনের উত্তম গুণ, তাই এসব বিধান মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। তবে কেও এসব বিষয় পালন না করলে তাকে সাজা দেওয়া যাবে না, তাকে অপমান করা যাবে না, এমনকি তাকে মন্দও বলা যাবে না। প্রয়োজন মনে করলে তাকে বুঝাতে হবে এবং উৎসাহ দিতে হবে।

৫. অন্য ধর্মের এবাদত ও পূজাঃ অন্য ধর্মের এবাদত ও পূজায় শরীক হওয়া যাবে না এবং এগুলো পালন করা যাবে না। কারণ সাধারণত এসব বিষয়ের সাথে কুফর ও শিরক জড়িত থাকে তাই এসব বিষয় পরিহার করে চলতে হবে এবং এসব ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকতে হবে।
তবে কোনো মুসলিম যদি নিরাপত্তা জনিত কারনে অথবা সরকারী বা সামাজিক দায়িত্ব পালনে সেখানে যায় তবে তা পাপ হিসেবে গন্য হবে না।

হুশিয়ারীঃ কোনো মুসলিম যদি সনাতন বা আধুনিক কোনো প্রকার কুফর বা শিরকে জড়িয়ে পড়ে তবে তার ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে মুনাফিক হয়ে চির জাহান্নামী হয়ে যাবে এবং তার যাবতীয় আ'মাল ও ইবাদাত নিস্ফল ও বরবাদ হয়ে যাবে, তাই এদের ব্যাপারেও উপরে উল্লেখিত হুঁশিয়ারি মেনে চলতে হবে।
তবে ইসলামী দেশের নিরাপত্তা কর্মী, গোয়েন্দা কর্মী এবং সামাজিক নেতারা নাগরিক নিরাপত্তার কাজে বা সরকারী কাজে দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে পূজাস্থানে যেতে পারবে। তবে সাবধান! কোনো অবস্থাতেই পূজায় শরীক হওয়া বা এতে নৈতিক সমর্থ দেওয়া যাবে না।

বিঃ দ্রঃ = জীবন নাশের হুমকি এলে অথবা জীবনের বা অঙ্গহানির ঝুঁকি এলে অথবা অন্য কোনোভাবে বাধ্য করা হলে কেও যদি বাধ্য হয়ে তার জীবন বা অঙ্গ রক্ষার্থে শুধু লোক দেখানোর জন্য কোনো প্রকার কুফর বা শিরক করে ফেলে এবং তার অন্তর ঈমানের উপর অটল ও অবিচল থাকে তবে সে ক্ষমার যোগ্য বলে গণ্য হবে, ইসলামী পরিভাষায় এ পদ্ধতির নাম রুখসাত। (দেখুন সূরাহ নাহ'লঃ ১০৬)

৬. সংস্কার ও সংস্কৃতিঃ কোনো সমাজ বা কোনো অঞ্চলের আঞ্চলিক রীতি তথা অঞ্চল কেন্দ্রিক সংস্কার ও সংস্কৃতি (যে গুলোর সাথে সরাসরি কুফর বা শিরক জড়িত নয়) থেকে বিরত থাকা এবং নিজের অধীনস্থদেরকে বিরত রাখার চেষ্টা করা উচিত। তবে কেও এসব কাজ করে ফেললে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা তাকে অসম্মান করা যাবে না। বরং এসব বিষয়ে তাকে বুঝানো যেতে পারে।